ইমাম ত্বাহাওয়ী লিখিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ইমাম আবু জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বাহাওয়ী রহ.

অনুবাদ : মোঃ আবদুল মতিন আবদুর রহমান

ও ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

بيان عقيدة أهل السنة والجماعة

«المعروف بالعقيدة الطحاوية»

« باللغة البنغالية »

الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله

ترجمة: عبد المتين عبد الرحمن

و د/ أبو بكر محمد زكريا

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

এখান থেকে লেখা শুরু করুন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

প্রখ্যাত আলেম, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু জাফর ওয়াররাক আততাহাবী র. মিসরে অবস্থানকালে বলেছিলেন:

ফুকাহায়ে মিল্লাত আবূ হানীফা আন-নুমান ইবন সাবেত আল কুফী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আল আনসারী এবং আবু আব্দুল্লাহ ইবন আল হাসান আশ শায়বানী রাহিমাহুমুল্লাহদের অনুসৃত নীতি অনুসারে এটা হল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ‘আক্বীদাহ বা দ্বীনী বিশ্বাস এবং তারা ধর্মের নীতিসমূহে যে ‘আক্বীদাহ পোষণ করতেন এবং সে সব নীতি অনুসারে তারা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের মনোনীত দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করতেন তার বিবরণ।

১। মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে তাঁর তাওহীদ[1] তথা একত্ববাদ সম্পর্কে আমরা বলব, নিশ্চয় আল্লাহ এক, যাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই।

---

[1] জানা উচিত যে, যে তাওহীদ নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাব নাযিল হয়েছে, তার তিনটি অংশ রয়েছে। যা কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং দায়িত্ববানদের বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই তা নির্ধারিত হয়েছে।

প্রথম অংশ, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর মহান কর্মকাণ্ডে এক সত্তা জ্ঞান করা। তা হচ্ছে, এ ঈমান রাখা যে মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগতের সকলের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। এগুলোতে তার কোনো শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ [الزمر: ٦٢]

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা"। [সূরা আয-যুমার: ৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ﴾ [يونس: ٣]

"নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন"। [সূরা ইউনুস: ৩] তাওহীদের এ অংশে আরবের মুর্তিপূজারী মুশরিকরা ঈমান রাখত, যদিও তাদের অধিকাংশই পুনরুত্থান ও হাশর-নশর অস্বীকার করত। কিন্তু এ

ঈমান তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি, কারণ তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্য কিছুকে শরীক করত, তার ইবাদতের সাথে মূর্তি ও অন্যান্য কিছুরও ইবাদত করত এবং রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করেনি।

দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, তাওহীদুল ইবাদাহ, যাকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। আর উলুহিয়্যাহ অর্থই ইবাদত। তাওহীদের এ অংশটিই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু তাদের থেকে উল্লেখ করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে,

﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ ٥ ﴾ [ص: ٤، ٥]

"আর কাফেররা আশ্চার্য হয়েছিল যে, তাদের কাছে তাদের থেকেই একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফেররা বলল, এ তো জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়"। [সূরা সদ, ৪-৫] অনুরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে। তাওহীদের এ অংশ ইবাদতকে খালেস বা নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা হওয়া এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যে বাতিল এসব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাওহীদের এ অংশই কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত অর্থ। কেননা এ কালেমা অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোনো মাবুদ নেই, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]

"এটা এজন্যই যে, আল্লাহ, একমাত্র তিনিই সত্য (মা'বুদ), তাঁকে ছাড়া তারা অন্য যাকেই আহ্বান করে সেসবই বাতিল"। [সূরা আল-হাজ্জ: ৬২]

তৃতীয় অংশ: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। আর তা হচ্ছে, মহান আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সহীহ সুন্নাহতে যে সকল নাম ও গুণ এসেছে সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন, সেগুলোকে মহান আল্লাহর জন্য যথোপযুক্তভাবে সাব্যস্তকরণ, কোনো প্রকার বিকৃতি কিংবা অর্থমুক্তি অথবা কোনো প্রকার ধরণ নির্ধারণ বা সাদৃশ্য নির্ণয় ব্যতীত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤ ﴾ [الاخلاص: ١، ٤]

“১। বলুন, ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়, ২। ‘আল্লাহ্ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); ৩। ‘তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি, ৪। ‘এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।” [সূরা আল-ইখলাস, ১-৪] তিনি আরও বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ۝١١ ﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মত কোনো কিছু নেই, আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা: ১১] মহান সত্তা আরও বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

“আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তোমরা তাকে সেগুলো দিয়েই আহ্বান কর”। [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮০] অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহু সূরা আন-নাহলে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٦٠ ﴾ [النحل: ٦٠]

“আর আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় মহত্তম উদাহরণ, আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নাহল:৬০] এ অর্থে আরও বহু আয়াত রয়েছে। এখানে উত্তম উদাহরণ বলতে এমন সুউচ্চ গুণাগুণ বোঝানো হয়েছে যাতে কোনো

২। তাঁর মত কিছুই নেই।

অপূর্ণতা নেই। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী, তাদের যথাযথ সুন্দর অনুসরণকারী তাবে‘ঈগণের অভিমত যে, তাঁরা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাগুণসম্পন্ন আয়াত ও হাদীসসমূহকে যেভাবে এসেছে সেভাবে পরিচালনা করতেন, সেগুলোর অর্থকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু এর জন্য সাদৃশ্য নির্ধারণ মুক্তভাবে সাব্যস্ত করতেন। অনুরূপভাবে তাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুকে তাঁর সৃষ্টির কারও সামঞ্জস্যবিধান থেকে পবিত্র করতেন, কিন্তু সেগুলোকে (কুরআন ও হাদীসের গুণাগুণসম্পন্ন ভাষ্যসমূহকে) অর্থহীন করতেন না। আর তাঁরা যা বলেছে সেটার মাধ্যমেই কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ একই সুত্রে গাঁথা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই যারা তাদের বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আর মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে তাঁদেরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।” [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০] মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর একান্ত দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লাহই সাহায্যকারী। [ই.বা.]

৩। কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

৪। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

৫। তিনি ক্বাদীম[2] বা প্রাচীন, যার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত, যার কোনো অন্ত নেই।

---

[2] 'ক্বাদীম' বা 'প্রাচীন' শব্দটি লেখক আল্লাহর জন্য ব্যবহার করেছেন। অথচ এ নামটি মহান আল্লাহর নাম হিসেবে কুরআন ও সুন্নায় আসে নি। যেমনটি এ ভাষ্যের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবন আবিল ইয আল-হানাফী এবং অন্যান্যগণ সতর্ক করে জানিয়েছেন। এটা তো কেবল কালাম শাস্ত্রবিদরা উল্লেখ করেছে; তারা এর দ্বার মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে সবকিছুর পূর্বে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। তবে এটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহর নামসমূহ ওহীর মাধ্যমে জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই সেগুলোকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যের মাধ্যমেই সাব্যস্ত করা যাবে। অন্য কিছু দ্বারা সাব্যস্ত করা জায়েয নেই। কোনো প্রকার বিবেকের মত প্রদানের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করা বৈধ নয়, যেমনটি সালাফে সালেহীন তথা সঠিক পূর্বসুরী আলেমগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন।

তাছাড়া 'কাদীম' বা প্রাচীন শব্দটিকে কালাম শাস্ত্রবিদরা যে অর্থে ব্যবহার করেছে বাস্তবে সেটি উক্ত অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ আরবী ভাষায় 'কাদীম' বলা হয় যা কোনো কিছুর পূর্বে হয়, যদিও পূর্বে তা অস্তিত্বহীন বিষয় হোক না কেন। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]

৬। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই।

৭। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না।

৮। কল্পনাসমূহ তাঁর (সম্পর্কে জানার জন্য) ধারে কাছে) পৌঁছুতে পারে না এবং বুঝ-জ্ঞান তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না।

৯। আর তিনি সৃষ্ট বস্তুর সদৃশ নন।

১০। তিনি চিরঞ্জীব, মারা যাবেন না, চির জাগ্রত, নিদ্রা যান না।

"অবশেষে সে চাঁদ শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।" [সূরা ইয়াসীন, ৩৯] তবে গ্রন্থকারের পরবর্তী কথা 'যার কোনো শুরু নেই' এর দ্বারা বিশুদ্ধ অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। তারপরও এটাকে আল্লাহর নাম হিসেব গণ্য করা যাবে না। কারণ কুরআন বা হাদীসে সেটা নাম হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। তার বদলে আল্লাহর 'আল-আউয়াল' (সর্বপ্রথম) নামটিই যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ﴾ [الحديد: ٣]

"তিনিই প্রথম আর তিনিই শেষ"। [সূরা আল-হাদীদ, ৩] আল্লাহই তাওফীকদাতা। [ই.বা.]

১১। তিনি (এমন) সৃষ্টিকর্তা (যার সৃষ্টির প্রতি) কোনো প্রয়োজন (সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া) ছাড়াই, তিনি কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই (সবার) রিযকদাতা।

১২। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী।

১৩। সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি এবং তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন।

১৪। সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম ‘‘খালেক’’ (সৃষ্টিকর্তা) হয়নি। অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম ‘‘বারী’’ (উদ্ভাবক) হয়নি।

১৫। প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন ‘রব’ বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন ‘খালেক’ বা সৃষ্টিকর্তা।

১৬। মৃতদেরকে জীবন দান করার ফলে যেমন তাঁকে 'জীবনদানকারী' বলা হয়ে থাকে তেমনিভাবে তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এই (জীবনদানকারী) নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই 'সৃষ্টিকর্তা' নামের অধিকারী ছিলেন।

১৭। এটা এই জন্য যে, তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী; আর সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। "তাঁর মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ১১]

১৮। তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন।

১৯। এবং তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

২০। এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

২১। সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।

২২। এবং তিনি তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩। আর সবকিছু তাঁর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হয়েই থাকে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

২৪। তিনি (আল্লাহ) অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।

২৫। আর সকলেই তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই এ অনুগ্রহ ও এ ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে[3]।

২৬। তিনি কারও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার উর্ধ্বে।

২৭। তাঁর ফয়সালার কোনো পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।

২৮। উপরে উল্লিখিত সব কিছুর উপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, এ (ভালো-মন্দ) সব কিছুই আল্লাহর তরফ হতে আগত।

২৯। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবী এবং সন্তোষপ্রাপ্ত রাসূল।

---

[3] কারণ, মানুষ এ দু'টি কাজ তথা অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যেই সর্বদা থাকে। মানুষ হয় ঈমানদার, হিদায়াতপ্রাপ্ত যা আল্লাহর অনুগ্রহ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দয়া ও নেয়ামত। অথবা মানুষ পথভ্রষ্ট, কুফরী বা ফাসেকীর মাধ্যমে বক্রতা অবলম্বনকারী যা মহান আল্লাহর ন্যায়-বিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ীই সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং কেউই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। [সম্পাদক]

৩০। তিনি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, মুত্তাক্বীদের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব (বন্ধু)।

৩১। আর তাঁর পরবর্তী যুগে নবুওয়াতের যে সব দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তার সবগুলিই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ।

৩২। তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতিসহকারে সকল জিন ও সমস্ত মাখলুকের প্রতি প্রেরিত।

৩৩। নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না[4]। এই কালামকে তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী হিসাবে নাযিল করেছেন আর ঈমানদারগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কথা বা কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টবস্তু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআন শুনে

---

[4] উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কথা বলার কোনো ধরণ নেই এটা বলা হয়নি, বরং কোনো ধরণ জানা নেই বলা হয়েছে। আল্লাহর কথা বলার ধরণ আমাদের জানা না থাকলেও সেটার একটা ধরণ তো অবশ্যই রয়েছে। [সম্পাদক]

তাকে মানুষের কালাম (কথা) বলে ধারণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। (যে কুরআনকে মানুষের কথা বলবে) আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দা করেছেন, তাকে দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ۝٢٦ ﴾ [المدثر: ٢٦]

"শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির: ২৬) আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের এ ভীতি তো তাকে প্রদর্শন করিয়েছেন যে বলে,

﴿ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ ۝٢٥ ﴾ [المدثر: ٢٥]

"এটাতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়"। (সূরা মুদ্দাস্‌সির: ২৫) অতএব, আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম আর তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।

৩৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি

প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফেরদের মত নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলীতে মানুষের মত নন।

৩৫। আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সে দেখা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নয়, আর তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। যেমনটি কুরআন ঘোষণা করে বলেছে,

﴿وُجُوهٌ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

“সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হবে, সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” [সূরা আল-কিয়ামাহ:২২] এ দেখার সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সে ভাবেই অনুষ্ঠিত হবে।

আর এ সম্পর্কে যা কিছু সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে তা যেমনটি তিনি বলেছেন সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে আর সেগুলোর যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটাই ধর্তব্য হবে। এতে আমরা আমাদের মতের

উপর নির্ভর করে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা করব না, অনুরূপ কোনো প্রকার প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না। কারণ, কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দ্বীনকে (ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে) নিরাপদ রাখতে পারে, যখন সে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের (নির্দেশনার) কাছে নিঃশর্তভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের ব্যাপারসমূহকে যে সেটা জানে সে আল্লাহর দিকেই প্রর্ত্যাবর্তন করাবে।

৩৬। বশ্যতা স্বীকার আর আত্মসমর্পণ ছাড়া কারও পা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের পিছনে লেগে থাকবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার সে ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান হতে বঞ্চিত রাখবে। ফলে সে কুফরী ও ঈমান সত্য ও মিথ্যা, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মু’মিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে।

৩৭। যে ব্যক্তি জান্নাতীদের দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে, (অথবা সেটাকে অনিশ্চিত বিষয় জ্ঞান করবে) অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সে দেখার ভুল ব্যাখ্যা দিবে, তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, আল্লাহকে দেখার বিষয়টি, অনুরূপ রবের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গুণাগুণের বিষয়ে প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে- সে (টার ধরণ) সম্পর্কে কোনোরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা না করা এবং সেটাকে অবিকৃতভাবে মেনে নেওয়া (গ্রহণ করা)। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দ্বীন (অনুসৃত নীতি)। যে ব্যক্তি (রবের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাগুণকে) নফী (অস্বীকৃতি) এবং তাশবীহ (সাদৃশ্য) হতে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে এবং সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে। কারণ, আমাদের মহান রব একক ও নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর গুণে ভূষিত নয়।

৩৮। আর আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি[5] থেকে উর্ধ্বে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না।

---

[5] "আর আল্লাহ তা 'আলা সীমা, পরিধি থেকে উর্ধ্বে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না।" এ কথাটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যাকারী ও বিকৃতিকারীদের কেউ সে অস্পষ্টতার সুযোগ নিতে পারে। অথচ গ্রন্থকারের এ কথার মধ্যে তাদের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কারণ উক্ত কথা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সৃষ্টির কারও সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা। তবে তিনি একটি অস্পষ্ট বাক্য নিয়ে এসেছেন যা স্পষ্ট করার প্রয়োজন; যাতে করে সন্দেহ সংশয় দূরিভূত হয়। এখানে গ্রন্থকার 'সীমা' বলে বুঝিয়েছেন সে সীমা যা মানুষ জানে। কারণ মহান আল্লাহর সীমা-পরিসীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। যেমন তিনি সূরা ত্বা-হায় বলেন,

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ۝١١٠ ﴾ [طه: ١١٠]

"তিনি তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে সবই জানেন আর তারা তাঁকে জ্ঞানে আয়ত্ব করতে পারে না"। [সূরা ত্বা-হা: ১১০] সালাফে সালেহীন তথা পূণ্যবান পূর্বসূরীগণের মধ্যে যারা আরশের উপর আরোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত সীমা বর্ণনা করেছেন, সেখানে 'সীমা' দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সীমা-পরিসীমার কথা যা আল্লাহ তা'আলা জানেন, বান্দার জানা কোনো সীমা নয়।

গ্রন্থকারের অন্য কথা, আল্লাহ তা'আলা 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত' এর দ্বারাও তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলাকে তাঁর প্রজ্ঞা ও সত্তার সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলী যেমন চেহারা, হাত, পা ইত্যাদিতে সৃষ্টির কারও সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা থেকে পবিত্র করা। তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা চেহারা, হাত, পা ইত্যাদি গুণাগুণে গুণান্বিত, যদিও তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টিকুলের কারও গুণের মত নয়; আর আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ তাঁর এ গুণের ধরণ সম্পর্কে অবহিত নয়। বিদ'আতীরা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করে থাকে যাতে করে এর দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করতে পারে। আর সে উদ্দেশ্যে তারা এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেন নি এবং নিজের জন্য সাব্যস্ত করেন নি; যাতে করে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হয়ে না পড়ে এবং হকপন্থীরা তাদের উপর দোষ না দিতে পারে। গ্রন্থকার অবশ্য 'বিদ'আতীদের' মত উদ্দেশ্য নেন নি। কারণ তিনি আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্তকারী। এ আকীদায় তার কথা-বার্তার একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে, একাংশ অপর অংশের সত্যায়ণ করে এবং সন্দেহযুক্ত অংশকে সন্দেহমুক্ত অংশ ব্যাখ্যা করে।

অনুরূপভাবে গ্রন্থকারের কথা 'অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টিগত ছয়টি দিক। এর দ্বারা মহান আল্লাহর উচ্চে থাকা ও আরশের উপর তাঁর আরোহন করার বিষয়টি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এটি সৃষ্ট ছয় দিকের অভ্যন্তরে নয়। কারণ তিনি সৃষ্টিজগতের উপরে এবং সৃষ্টিজগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মহান আল্লাহর সুউচ্চে থাকার বিষয়টির উপর ঈমান থাকা তিনি তাঁর বান্দাদের ফিতরাত তথা অন্তরে স্বাভাবিকভাবে গেঁথে দিয়েছেন। তাদের স্বাভাবিক অন্তরের কথা হচ্ছে যে, তিনি উপরের দিকে। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা নবী

৩৯। আর মি‘রাজ সত্য, নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামকে নৈশকালে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো উর্ধ্বে নেয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন।

﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ۝١١ ﴾ [النجم: ١١]

“তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি।” [সূরা আন-নাজম: ১১] সুতরাং আল্লাহর তাঁর উপর আখেরাতে এবং দুনিয়ার জগতে সালাত ও সালাম পেশ করুন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং সুন্দরভাবে তাঁদের অনুসারী তাবে‘ঈগণও এর উপর একমত হয়েছেন। কুরআনে কারীম ও সহীহ মুতাওয়াতির (নিরঙ্কুশ নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত) সুন্নাহ স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি উপরে রয়েছেন। হে প্রিয় পাঠক এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে সাবধান থাকুন এবং জেনে রাখুন যে এটাই সত্য, এটা ব্যতীত অন্য কিছু বাতিল। আর আল্লাহই তাওফীক দেওয়ার মালিক। [ই.বা.]

৪০। আর হাউয (পানির আধার) যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য।

৪১। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা‘আত, যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য।

৪২। “মী-ছাক” (দৃঢ় অঙ্গীকার), যা আল্লাহ তাআলা আদম এবং তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তা সত্য।

৪৩। মহান আল্লাহ শুরু থেকে এবং এখন, সব সময়েই ভলো করেই জানেন, কত লোক জান্নাতে যাবে আর কত লোক জাহান্নামে যাবে। এতে ব্যতিক্রম হবে না। তাই এ সংখ্যা কমবেও না, বাড়বেও না।

৪৪। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ সাধ্য করে দেওয়া হয়েছে। শেষ কর্ম দ্বারা

মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে এবং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় হতভাগা বলে নির্ধারিত হয়েছে।

৪৫। আর "তাকদীর" সম্পর্কে আসল কথা এই যে, এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশ্তা কিংবা প্রেরিত কোনো নবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে তথ্য আবিস্কার করতে যাওয়া অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আশাহত হওয়ার নিশ্চিত কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের ধাপ। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা 'তাকদীর' সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ ٢٣ ﴾ [الانبياء: ٢٣]

"তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে"। [সূরা আম্বিয়া: ২৩]

অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে "তিনি কেন এ কাজ করলেন?" সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

৪৬। (তাকদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনার প্রয়োজন), উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর ওলী তথা বন্ধুদের মধ্যে যার অন্তর জ্যোতিদীপ্ত তার জন্য এতটুকু জানাই প্রয়োজন। আর এটিই হচ্ছে জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞা বিভূষিতদের স্তর। (যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সংবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয় এবং তার কাছে আত্মসমর্পন করে)

কারণ, ইলম বা জ্ঞান দু'প্রকার। (১) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান[6]। (২) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট অবিদ্যমান[7]। বিদ্যমানকে

---

[6] আর তা হচ্ছে শরীয়তের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাজনিত জ্ঞান।

[7] গ্রন্থকার এখানে অবিদ্যমান জ্ঞান বলে গায়েবী জ্ঞান বুঝিয়েছেন। যা একমাত্র আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট। কোনো মানুষ যদি সেটার দাবী করবে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

﴿۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ﴾ [الانعام: ٥٩]

"আর তার কাছেই রয়েছে গায়েবের জ্ঞান, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না"। [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ ﴾ [النمل: ٦٥]

“বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা কেউই গায়েব জানে না”। [সূরা আন-নামল: ৬৫]

অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া আর তা কেউ জানে না। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ ... ﴾ [لقمان: ٣٤]

“নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন...”। [সূরা লুকমান: ৩৪] অনুরূপভাবে এতদসংক্রান্ত আরও বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না; যদিও তিনি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলদের নেতা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্যরা তো মোটেই জানার কথা নয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ জ্ঞানের কিছুই জানতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে তা হতে কিছু জানাতেন। এ জন্যই ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার উপর অপবাদ দেওয়ার বিষয় নিয়ে লোকেরা যখন বলাবলি করছিল তখন তিনি ওহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পবিত্রতার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক সফরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হার হারিয়ে গেলে তিনি বেশ কয়েকজনকে সেটার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন, সেটা কোথায় আছে সেটা জানতে পারেন নি, অবশেষে যখন উট দাঁড় করানো হলো তখন তারা হারটিকে উটের নিচে দেখতে পেল। আর কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে বহু দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। [ই.বা.]

অস্বীকার করাও যেমন কুফরী, অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবী করাও তেমনি কুফরী। বিদ্যমান জ্ঞানের সাধনা করা, আর অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষন করা হতে বিরত থাকাই সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয়।

৪৭। আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের উপর। আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার সবকিছুতে। যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত হবার কথা তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। যা বান্দার নসীবে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না আর যা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না।

৪৮। বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত

আর গায়েবী জ্ঞানের অন্যতম হচ্ছে, তাকদীরের জ্ঞান, যা আল্লাহ তার সৃষ্টির কাছে পর্দাবৃত রেখেছেন। সেটাও কোনো সৃষ্টিই তা জানতে পারে না।

রয়েছেন। অতএব, তিনি সেটাকে অকাট্য ও অবিচল তাকদীর হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। আসমান ও যমীনের কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী, অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না, একে সংকোচন কিংবা পরিবর্ধনও করতে পারবে না।

আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফাতের মূলবস্তু এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াহদানিয়াত ও রবুবিয়ত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ۝٢﴾ [الفرقان: ٢]

"তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ অনুপাত অনুসারে পরিমিতি প্রদান করেছেন।" [সূরা আল-ফুরকান: ৩)।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন,

﴿وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ۝٣٨﴾ [الاحزاب: ٣٨]

"আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।" [সূরা আহযাব: ৩৮]।

অতএব, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে এবং রোগগ্রস্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়েছে।

৪৯। আর আরশ এবং কুরসী সত্য।

৫০। আর আল্লাহ তা'আলা আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী।

৫১। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম।

৫২। আমরা আরও বলি যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। (আমরা একথা বলি) এর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে।

৫৩। আর আমরা আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ, নবীগণ ও রাসূলগণের ওপর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তারা প্রকাশ্য সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৫৪। আমাদের ক্বিবলাকে (বায়তুল্লাহকে) যারা ক্বিবলা বলে স্বীকার করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা শরীয়তকে স্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে।

৫৫। আমরা আল্লাহর সত্ত্বা (জাত) সম্পর্কে অন্যায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না এবং তাঁর দ্বীন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হই না।

৫৬। কুরআন সম্পর্কে আমরা কোনো তর্কে লিপ্ত হই না এবং সাক্ষ্য প্রদান করি যে, কুরআন বিশ্ব চরাচরের রবের কালাম (কথা)। এটা নিয়ে জিবরীল আমীন অবতীর্ণ হয়েছেন। অতঃপর তিনি তা সকল রাসূলদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেন। এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী), কোনো সৃষ্টির কথা এর সমতুল্য নয়। আর আমরা একে সৃষ্ট

বলি না এবং (এ ব্যাপারে) আমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধাচরণ করি না।

৫৭। কোনো গুনাহর কারণে কোনো আহলে ক্বিবলাকে (মুসলিমকে) কাফির বলে অভিহিত করি না; যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল (জায়েয) মনে করে[৪]।

---

[৪] গ্রন্থকারের কথা, 'কোনো গুনাহর কারণে কোনো আহলে ক্বিবলাকে (মুসলিমকে) কাফির বলে অভিহিত করি না; যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল (জায়েয) মনে করে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনয়নকারী কোনো একত্ববাদী মুমিন মুসলিমকে কোনো গুনাহ যেমন ব্যভিচার, মদপান, সুদ খাওয়া ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি অপরাধ করার কারণে কাফের বলে না, যতক্ষণ না সে এগুলোকে বৈধ মনে করে করবে। কিন্তু যদি এগুলোকে বৈধ হিসেবে সম্পাদন করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ এর মাধ্যমে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করেছে, তাঁর দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। তবে যদি সে বৈধ হিসেবে গ্রহণ না করে এ গুনাহগুলো করে বসে তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট এ অপরাধগুলোর কারণে তাকে কাফের বলা যাবে না। বরং তাকে দুর্বল ঈমানের অধিকারী বলা হবে। যে ধরণের অপরাধ সে করেছে সে ধরণের অপরাধের জন্য শরীয়তে যে বিধান দেওয়া হয়েছে যেমন ফাসেক (পাপাচারী) বলা, কিংবা তার উপর যে হদ তথা নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে তা প্রযোজ্য করা হবে। আর এটিই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত। এ ব্যাপারে খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা এবং

৫৮। আর আমরা বলি না যে, ঈমান আনার পর কোনো গুনাহ করাতে ক্ষতি নেই।

৫৯। আমরা আশা করি যে, সৎকর্মশীল মু'মিনগণকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা তাদের সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে যাবো না, আর তাদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণাও দান করবো না[9]। আর আমরা

যারা তাদের বাতিল মতামতের অনুসরণ করে চলে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। তন্মধ্যে খাওয়ারিজরা তাদেরকে গুনাহের কারণে কাফের বলে থাকে (অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের উপর দ্বীন ত্যাগের শাস্তি আর আখেরাতে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামী বলে থাকে)। অন্যদিকে মু'তাযিলারা তাদেরকে দু' অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থানে রাখে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদেরকে ঈমান ও কুফরীর মাঝে রয়েছে বলে থাকে, কিন্তু আখেরাতে খাওয়ারিজদের মতই তাদেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে। এ উভয় দলের মতই কুরআন, সুন্নাহ ও এ উম্মতের সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল বলে স্বীকৃত। এ দু'দলের বিষয় কোনো কোনো মানুষের মনে তার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সন্দেহ-সংশয় তৈরী করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলাদের আকীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি হকপন্থীদের নিকট যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি দিবালোকের মতই স্পষ্ট। আল্লাহর কাছেই সার্বিক তাওফীক কামনা করি। [ই.বা.]

[9] এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন, যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত

দশজন ও অন্যান্য সুসংবাদপ্রাপ্তগণ, তাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা থেকে বিরত থাকা। যেমনটি গ্রন্থকারের শেষের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। তবে এটা জানা আবশ্যক যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হচ্ছে, সাধারণভাবে তাকওয়ার অধিকারী ঈমানদার ব্যক্তিগণ জান্নাতে যাবে, আর কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ব্যক্তিরা জাহান্নামে যাবে। যেমনটি কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ ﴾ [الطور: ١٧]

"নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে"। [সূরা আত-তূর: ১৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ ﴾ [التوبة: ٧٢]

"আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের---যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য।"। [সূরা আত-তাওবাহ: ৭২] অনুরূপ অর্থে আরও বহু আয়াত রয়েছে যা এ কথর উপর প্রমাণবহ।

আর কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ ﴾ [فاطر: ٣٦]

"আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের উপর ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও

তাদের গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আমরা তাদের জন্য আশংকা বোধ করব, কিন্তু আমরা তাদেরকে নিরাশ করব না।

৬০। নিঃশঙ্ক ও নৈরাশ্যবোধ একজন মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। আহলে ক্বিবলার জন্য সত্য পথ তো এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকার মধ্যেই নিহিত।

৬১। কোনো মানুষ শুধু তা অস্বীকার করলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, যা স্বীকার করে সে তাতে প্রবেশ করেছে[10]।

লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।”। [সূরা ফাতির: ৩৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥ ﴾ [النساء: ١٤٥]

“মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবেন না।”। [সূরা আন-নিসা: ১৪৫] তাছাড়া অনুরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে যা এ অর্থের উপর প্রমাণবহ। আর আল্লাহই হচ্ছেন তাওফীকদাতা। [ই.বা.]

[10] এ সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিশুদ্ধ নয়, বরং কথাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ কাফের শাহাদাতাইন (তথা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এ) দু’টোর সাক্ষ্য দিলেই ইসলামে প্রবেশ করবে, যদি সে সেটা মুখে উচ্চারণ না করতে পারে।

কিন্তু যদি উচ্চারণ করতে পারে তবে (শাহাদাতাইনের সাথে সাথে) এমন কিছু থেকেও তাকে তাওবাহ করতে হবে যা (করলে বা বিশ্বাস করলে) তার কাফির হওয়াকে আবশ্যক করে তোলে। **তাছাড়া অস্বীকার করা ছাড়াও এমন বেশ কিছু কারণ রয়েছে যা কোনো মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়,** আলেমগণ সেগুলো তাদের গ্রন্থে মুরতাদ তথা দ্বীন ত্যাগের বিধান আলোচনায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমন,

- ইসলামের বদনামী করা, ইসলামের প্রতি অপবাদ দেওয়া, ইসলাম সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করা, অথবা ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোনো অশোভন কথা বলা, কিংবা আল্লাহ, তাঁর রাসূল বা তাঁর কিতাব অথবা তাঁর দেওয়া শরীয়তের কোনো সামান্যতম বিধান নিয়েও ঠাট্টা-উপহাস করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

"বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?' 'তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬] [ই.বা.]

- তন্মধ্যে আরও রয়েছে, মূর্তি বা বেদী পূজা করা, অথবা প্রয়োজন পূরণার্থে মৃতদেরকে আহ্বান করা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের দ্বারা উদ্ধার কামনা করা, তাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি। কারণ এসব কিছু 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর কালেমার পরিপন্থী কাজ। কারণ এ কালেমা প্রমাণ করে যে ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ঐকান্তিক হক বা অধিকার। আর ইবাদতের প্রকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দো'আ, উদ্ধারপ্রার্থনা, রুকূ, সাজদা, জবাই, মান্নত ইত্যাদি। সুতরাং যে কেউ এগুলো

৬২। আর ঈমান হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ করা।[১১]

থেকে সামান্যতম কিছুও আল্লাহ ব্যতীত মূর্তি, বেদী, ফিরিশতা, জ্বিন, কবরবাসী ইত্যাদি এবং কোনো সৃষ্টির কারোর জন্য নিবেদন করবে সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে শির্ক করলো, সে ব্যক্তি কালেমা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' যথাযথভাবে বাস্তবায়ণ করেনি।

উপরে বর্ণিত মাসআলাগুলোর প্রত্যেকটিই এমন যে যার ব্যত্যয় ঘটলে আলেমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। **অথচ এগুলোর কোনোটিই অস্বীকার করার মাসআলা নয়।** (অর্থাৎ এগুলো দ্বীনের কোনো অঙ্গকে অস্বীকার করার মাধ্যমে সংঘটিত হয়নি) আর এগুলো যে মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় তার সপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল খুবই জানা বিষয়। এছাড়া আরও অনেক অনেক মাসআলা রয়েছে যেগুলো করলে মুসলিম কাফের হয়ে যায়, অথচ সেগুলো অস্বীকার করার মত মাসআলা নয়, (অর্থাৎ এগুলো দ্বীনের কোনো অঙ্গকে অস্বীকার করার বিষয় নয়) তারপরও আলেমগণ সেগুলো মুরতাদ বা দ্বীনত্যাগকারীর বিধানের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। যদি দেখার ইচ্ছা হয় তো সেখানে দেখা যেতে পারে। আর আল্লাহই হচ্ছেন তাওফীকদাতা। [ই.বা.]

[11] এ সংজ্ঞায় কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী ও ঘাটতি রয়েছে। বরং বিশুদ্ধ কথা, যার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা তা হচ্ছে, ঈমান, কথা, কাজ ও বিশ্বাসের নাম, যাতে আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ ঘটে এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে ঘাটতি হয়। এ কথার উপর কুরআন ও সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদি অগণিত অসংখ্য। এ কিতাবের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফী অনেকগুলো

৬৩। শরীআত এবং তার ব্যাখ্যায় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক্ক বা সত্য।

৬৪। ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই সমান[12], তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে

উল্লেখ করেছেন। যদি প্রয়োজন মনে কর তো সেখানে দেখে নাও। ঈমানকে আমলের গণ্ডির বাইরে রাখা মূলত: মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত। আহলে সুন্নাত ও তাদের মধ্যকার মতভেদ কেবল শব্দগত বিরোধে সীমাবদ্ধ নয়, রবং সেটা যেমন শব্দগত বিরোধ তেমনি তা অর্থগত বিরোধও। কারণ এ মতভেদের উপর অনেক বিধান নির্ভর করছে, যারা আহলে সুন্নাত এবং মুরজিয়া উভয় সম্প্রদায়ের কথা-বার্তা নিয়ে চিন্তা করবে তারা সেটা সহজেই জানতে পারবে। [ই.বা.]
বস্তুত: ঈমান ও আমলের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষ যেমন বীজের পরিচয় বহন করে, তেমনি আমল ঈমানের পরিচয় বহন করে। আক্বীদাহ ও আমলের একটিকে অপরটি থেকে বাদ দিয়ে ঈমানের কল্পনাই করা যায় না। তাই মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ঈমান হচ্ছে তিনটি বস্তুর সমন্বয়: (১) অন্তরের বিশ্বাস, (২) মূখের স্বীকৃতি এবং (৩) আরকান সহ আহকামের বাস্তবায়ন।
- অনুবাদক।

[12] কথাটিতে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। বরং তা একটি বাতিল কথা। কারণ ঈমানদারগণ সবাই ঈমানের দিক থেকে একই পর্যায়ের নয়। তাদের মধ্যে বড় ধরণের প্রার্থক্য বিদ্যমান। যেমন রাসূলগণের ঈমান অন্যদের ঈমানের মত নয়। অনুরূপ খোলাফায়ে রাশেদীনসহ অন্যান্য সাহাবীগণের ঈমান এবং তাঁরা ব্যতীত

আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আকড়ে ধরার মাধ্যমে।

৬৫। সব মু'মিন ব্যক্তিই দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওলী বা বন্ধু। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তাঁর অধিক অনুগত এবং কুরআনের বেশী অনুসারী।

৬৬। আর ঈমান (এর বিস্তারিত রূপ) হচ্ছেঃ আল্লাহ, তাঁর মালায়েকা (ফেরেশ্তা), তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল মন্দ, মিষ্টি ও তিক্ত, সবই আল্লাহর তরফ থেকে (তাঁরই অনুমতিতে) ঘটে থাকে এ ঈমান (স্বীকৃতি) রাখা।

৬৭। আর আমরা উল্লিখিত বিষয় সবগুলোর উপর ঈমান (দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি) পোষণ করি। আমরা রাসূলদের মধ্যে (ঈমানের

অন্যদের ঈমান একরকম নয়। এ তারতম্যের কারণ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর নাম, তাঁর গুণাবলী এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যে শরী'আত প্রবর্তন করেছেন বান্দার অন্তরে অবস্থিত সেটার জ্ঞানে তারতম্য থাকা। আর এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত। মুরজিয়া ও তাদের মতের পক্ষের লোকেরা এটার বিরোধিতা করে থাকে। আল্লাহই হচ্ছেন সাহায্যকারী। [ই.বা.]

ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না। তাঁরা যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি।

৬৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের মধ্যে যারা (শির্ক ব্যতীত অপরাপর) কবীরা গুনাহ করবে তারা তাওবা নাও করলেও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না- যদি তারা তাওহীদ তথা একত্ববাদী হয়ে মারা গিয়ে থাকে। যখন তারা ঈমানদার অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিচারের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি তিনি চান তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং নিজ গুণে তাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সব অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।” [সূরা নিসা: ৪৮]

আর যদি তিনি চান, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবেন এবং তাও হবে তার ন্যায়বিচার। অতঃপর আল্লাহপাক তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর (অনুমতিপ্রাপ্ত) সুপারিশকারীদের সুপারিশের

ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিবেন এবং জান্নাতে প্রেরণ করবেন।

এর কারণ হল এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মা'রিফাতের অধিকারী (স্বীকারকারী) নেককার বান্দাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের তাঁর অস্বীকারকারীদের ন্যায় করেন নি, যারা তাঁর হিদায়েতের পথ হতে অকৃতকার্য হয়েছে। তারা তাঁর বন্ধুত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি।

৬৯। আর আমরা প্রত্যেক সৎ ও পাপী মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাযার সালাত আদায় করার পক্ষে মত প্রদান করি।

৭০। আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করব না এবং তাদের কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফরী ও শির্ক অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এগুলির

কোনো একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেই।

৭১। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের উম্মতদের কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার পক্ষে মত দেই না, যদি না এমন কেউ হয় যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব[13]।

৭২। আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিব না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যচরণের আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দো‘আ করব।

[13] আর তা ওয়াজিব হয় তিনটি কারণে। এক. বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের কারণে, দ্বিতীয়. কোনো সম্মানিত মানুষকে হত্যা করার কারণে, তিন. দ্বীনে ইসলাম পরিত্যাগ করে কাফের হওয়ার কারণে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭৮; মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৬] [সম্পাদক]

৭৩। আমরা সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করব[14]। আমরা জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জামাআতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকব।

৭৪। আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসব এবং অন্যায়কারী ও আমানতের খেয়ানতকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করব।

৭৫। যে সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে সব বিষয়ে আমরা বলব, ‘‘আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অধিক জানেন।’’

৭৬। সফরে ও গৃহে অবস্থানকালে আমরা হাদীসের নিয়মানুসারে মোজার উপরে মাসেহ করার পক্ষে মত প্রদান করি।

৭৭। মুসলিম শাসক ভাল হউক কিংবা মন্দ হউক- তার অনুগামী হয়ে হজ করা এবং জিহাদ করা কেয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত

---

[14] সুন্নাত এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, আর জামা‘আত অর্থ, যে পথের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম চলে গেছেন সে পথে চলাচলকারী লোকসকল। সকল সাধারণ মুসলিমই এর অংশ। এর দ্বারা কোনো দল বুঝানো হয়নি। [সম্পাদক]

থাকবে। এ দু'টি জিনিসকে কোনো কিছুই বাতিল কিংবা ব্যাহত করতে পারবে না।

৭৮। আমরা কিরামান-কাতিবীন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) ফেরেশ্তাদের ওপর ঈমান রাখি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের ওপর পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

৭৯। আমরা মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশ্তার) উপরও ঈমান রাখি। তাকে সৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয্ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৮০। আমরা শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য কবরের আযাবের প্রতি ঈমান রাখি এবং এও ঈমান রাখি যে, কবরের মুনকার ও নাকীর (দুই ফেরেশ্তা) মৃত ব্যক্তির রব, দ্বীন, ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমদের নিকট হতে বহু হাদীছ ও উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

৮১। কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের অন্যতম অথবা তা জাহান্নামের গহ্বরসমূহের অন্যতম।

৮২। আমরা পুনরুত্থান, কেয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, (আল্লাহর সমীপে) পেশ করা, হিসাব নিকাশ, আমলনামা পাঠ, সওয়াব, (প্রতিদান) শাস্তি, পুলসিরাত এবং মীযান এসবের উপর ঈমান রাখি।

৮৩। (আরও ঈমান রাখি যে,) জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতে সৃষ্ট হয়ে আছে। এ দু'টি কোনো দিন লয় প্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয় প্রাপ্তও হবে না। আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর তা হবে তার ন্যায় বিচার। প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে।

৮৪। ভাল ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্দিষ্ট করে লেখা হয়েছে।

৮৫। ''সামর্থ্য''- (যা প্রত্যেক কর্মের জন্য অপরিহার্য। আর তা) দু'ধরণের- (১) যে সামর্থ্য বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট (কর্ম

বাস্তবায়িত করার সময় থাকা অপরিহার্য) যেমন কাজটির তাওফীক (যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ) তা কোনো সৃষ্টির গুণ হতে পারে না, (বরং তা কেবল আল্লাহর হাতে আর তাঁরই গুণ) এ ধরনের সামর্থ্য কেবল কার্য সম্পাদনের সময়েই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে (২) যে "সামর্থ্য" বলতে বুঝায় বান্দার সুস্থতা, সচ্ছলতা, সক্ষমতা, অঙ্গ প্রতঙ্গের নিরাপত্তা, তা অবশ্যই কর্মের পূর্বেই থাকা প্রয়োজন। আর এটার সাথেই তাকলীফ (তথা বান্দার জন্য আল্লাহর নির্দেশনা) সম্পৃক্ত। (অর্থাৎ এটা থাকলেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তার উপর প্রযোজ্য হয় নতুবা নয়)। আর এটা যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"তিনি কাউকে তার সামর্থ্যের উর্ধ্বে দায়িত্ব দেন না।" (সূরা বাকারা: ২৮৬)।

৮৬। বান্দাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দাদের উপার্জন।

৮৭। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। আর তারাও ততটুকুই দায়িত্ব

পালনের যোগ্যতা রাখে যতটুকু বোঝা আল্লাহ তাদের উপর চাপিয়ে থাকেন[15]। আর এটাই হচ্ছে

«لا حول ولا قوة إلا بالله»

“আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সৎ কর্ম করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা কারও নেই।” এ বাণীর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ছাড়া কারো কোনো অপরাধ থেকে বাঁচার এবং নড়া-চড়া করার ক্ষমতা নেই। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তা‘আলার তাওফীক ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য বরণ করার এবং তার উপরে দৃঢ় থাকার সাধ্য কারও নেই।

[15] এটা সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে যতটুকু তাকলীফ (দায়-দায়িত্ব বা নির্দেশনা) দিয়েছেন তারা তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখেন। বরং মহান আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তাদের প্রতি সহজ করে দিয়েছেন, তিনি তাদের উপর তাদের দ্বীনে কোনো সমস্যা রাখেন নি। এসবই হচ্ছে তার রহমত ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহই তাওফীকের মালিক।

৮৮। পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ফায়সালা এবং তাঁর বিধান অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপরে। তাঁর ফায়সালা সমস্ত কৌশলের উর্ধ্বে। যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। তিনি কখনও অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ ত্রুটি হতে বিমুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে, অন্য সবই স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আম্বিয়া ২১ : ২৩)

৮৯। জীবিত ব্যক্তিদের দো'আ এবং দান খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়ে থাকে।

৯০। আল্লাহ তা'আলা দো'আ কবুল করেন এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

৯১। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুরই মালিক এবং তাঁর মালিক কেউ নয়। মুহুর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মুহুর্তের জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হতে চাবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

৯২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্রুদ্ধ এবং রুষ্ট হন, তবে তা মাখলুকের ন্যায় নয়।

৯৩। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি, তবে তাদের কারও ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারও থেকে বিমুক্তি ঘোষণা করি না। তাদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা যারা তাদেরকে অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করে আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি। তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখা দ্বীন ও ঈমান এবং ইহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কুফরী, মুনাফিকী এবং সীমালংঘন করার পর্যায়ভুক্ত।

৯৪। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দেই। অতঃপর পর্যায়েক্রমে উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খলীফা বলে স্বীকার করি। তাঁরাই ছিলেন সুপথগামী খলীফা ও হিদায়েত-প্রাপ্ত নেতা।

৯৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ, এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর উক্তি সত্য। তাঁরা হলেনঃ (১) আবু বকর (২) উমর (৩) উসমান (৪) আলী (৫) তালহা (৬) যুবাইর (৭) সা‘দ (৮) সা‘ঈদ (৯) আবদুর রহমান ইবন আউফ এবং (১০) আমীনুল উম্মাহ (জাতির বিশ্বাসভাজন) আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম (আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন)

৯৬। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও সম্মানিত বংশধরদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করে সে মুনাফিকী হতে নিষ্কৃতি পায়।

৯৭। পূর্বে গত হওয়া সালাফে সালেহীন (নেককার পূর্বসূরী) আলেমগণ এবং তাঁদের যথাযথ পদাঙ্ক অনুসারী কল্যাণের অধিকারী হাদীসবিদগণ ও ফিক্বহের জ্ঞানের অধিকারী গবেষকগণকে আমরা

যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি। আর যারা এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তারা সঠিক পথের পথিক নয়।

৯৮। আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপরে প্রাধান্য দেই না বরং আমরা বলি, যে কোনো একজন রাসূল সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ।

৯৯। ওলীদের কারামত সম্পর্কে যে খবরাখবর আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং যা বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি।

১০০। আমরা কেয়ামাতের নিম্নলিখিত নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান রাখি: দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ। আর আমরা পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে আবির্ভাবের উপরও ঈমান রাখি।

১০১। আমরা কোনো ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোনো জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না এবং ঐ বক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।

১০২। আমরা (মুসলিম জাতির) ঐক্যকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং তা হতে বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি।

১০৩। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর দ্বীন এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।” (সুরা আলে-ইমরান, ১৯)।

অন্যত্র তিনি আরও বলেন,

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾ [المائدة: ٣]

“এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।” (সূরা আল-মায়েদা: ৩)

১০৪। ইসলাম মধ্যপন্থী দ্বীন। (নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ ও শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে) বাড়াবাড়ি ও কমতির মাঝামাঝি

তার অবস্থান, (আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেগুলোতে তাশবীহ তথা) সাদৃশ্য স্থাপন কিংবা (সে নাম ও গুণগুলোকে তা'তীল তথা) অর্থহীন করার মাঝে তার অবস্থান, (সৃষ্টিকুলের তাকদীরের ব্যাপারে তাদেরকে জবর তথা) ক্ষমতাহীন বাধ্য ও (কাদর তথা) নির্ধারণহীন মুক্ত এ দু'য়ের মাঝে তার অবস্থান। অনুরূপ (আল্লাহর ভয় ও ক্ষমার ব্যাপারে) নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তীতে তার অবস্থান।

১০৫। এগুলোই হচ্ছে আমাদের দ্বীন এবং আমাদের আক্বীদাহ বা মৌলিক বিশ্বাস। প্রকাশ্যে এবং অন্তরে তাই আমরা ধারণ করি। উপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম এবং বর্ণনা করলাম যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং আমাদের জীবনাবসান ঈমানের সাথে করেন। আর তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও বিবিধ মতামতের অনুসরণ থেকে এবং মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, ক্বাদরিয়া

প্রভৃতি বাতিল মতবাদসমূহ থেকে। যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’আতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং যারা বিভ্রান্ত মত ও পথের পক্ষ নিয়েছে আমরা তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট।

আল্লাহর নিকটেই যাবতীয় ভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক কামনা করছি।

সমাপ্ত